লক্ষণা

লক্ষণা—লক্ষ + ল্যু + টাপ্ ॥ অভিধা বা শক্তির সাহায্যে শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম মুখ্যার্থ।

লক্ষণার লক্ষণ

মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত, অথচ মুখ্যার্থ নহে এবংবিধ অর্থ যে বৃত্তির সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম 'লক্ষণা' (ক)।

'হাঙ্গামার স্থানে লাঠি যাইতেছে' বলিলে বুঝা যায়—'লাঠি লইয়া মানুষ যাইতেছে'। 'লাঠি' শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ 'মানুষ' নহে; কিন্তু কেবল লাঠির পক্ষে যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই এই ক্ষেত্রে লাঠি শব্দটি লাঠিধারী মানুষকে বুঝাইল।

উদাহরণ

এইভাবে, 'ভারত এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই' বলিলে 'ভারত' শব্দে ভারতের গভর্ণমেণ্ট বা ভারতীয় সৈন্যকে বুঝায়। ভারত

(ক) মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥
(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—৯)

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্ বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা ॥
(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কারিকা—৫)

শব্দের স্বাভাবিক অর্থ কিন্তু ইহা নহে। স্বাভাবিক অর্থে ভারত শব্দে দেশবিশেষকেই বুঝায়। এইভাবে যখন কোন শব্দ স্বাভাবিক অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই শব্দ লক্ষণা-বৃত্তির সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করিতেছে—বলা হইয়া থাকে।

আচার্যগণ বলেন—শব্দের এইরূপ অস্বাভাবিক অর্থ বুঝাইবার দুইটি প্রধান হেতু আছে; একটি 'রূঢ়ি', এবং অপরটি 'প্রয়োজন'। 'যাত্রাসার স্থানে লাঠি যাইতেছে' বলিলে, বহু সংখ্যক লাঠি লইয়া মানুষ

রূঢ়ি ও প্রয়োজন

যাইতেছে—এরূপ বুঝায়। এই ক্ষেত্রে লাঠির সংখ্যাধিক্য বুঝাইবার জন্য লক্ষণা ব্যবহৃত হইয়াছে; অতএব, লক্ষণা-প্রয়োগের হেতু—লাঠির সংখ্যাধিক্য বুঝান রূপ প্রয়োজন (খ)। অপর পক্ষে 'ভারত যুদ্ধে যোগদান করে নাই' বলিলে যখন ভারত শব্দে ভারতবর্ষনামক দেশকে না বুঝাইয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বা ভারতীয় সৈন্যকে বুঝায়, তখন সেখানে এইরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না; ঐ

(খ) রূঢ়াবুপাদানলক্ষণা যথা—'শ্বেতো ধাবতি'। প্রয়োজনে, যথা—'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'। অনয়োর্হি শ্বেতাদিভিঃ কুন্তাদিভিশ্চাচেতনতয়া কেবলৈর্ধাবনপ্রবেশনক্রিয়য়োঃ কর্তৃত্বমসম্ভবদিত্যেতৎসিদ্ধয়ে আত্ম-সম্বন্ধিনোঽশ্বাদীন্ পুরুষাদীংশ্চাক্ষিপ্যতে। পূর্বত্র প্রয়োজনাভাবাদ্ রূঢ়িঃ। উত্তরত্র তু কুন্তাদীনামতিগহনত্বং প্রয়োজনম্।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ক্ষেত্রে রূঢ়ি বশতঃই লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে। রূঢ়ি শব্দের অর্থ 'প্রসিদ্ধি'। লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে এরূপ প্রয়োগ হয় দেখিয়া ইহাকে 'রূঢ়ি' বলা হয় (গ)। আমার বিবেচনায় লক্ষণাতে রূঢ়িরূপ হেতু স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

ভক্তি=ভজ্+ক্তিন্। লক্ষণাকে ভক্তিনামেও অভিহিত করা হয়। এই বৃত্তিকে ভক্তি বলা হয় কেন—ইহা ভাবিবার বিষয়। ভজ্ ধাতুর এক অর্থ 'ত্যাগ করা' বা 'দান করা', অন্য অর্থ 'ভাঙ্গিয়া ফেলা', এবং অপর অর্থ 'সেবা করা' (ঘ)। লক্ষণা মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করে বলিয়াই সম্ভবতঃ তাহাকে ভক্তি নামে অভিহিত করা হয়। তাহা ছাড়া, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি দ্বারা শব্দার্থনির্ণয়ের যে লোক-প্রসিদ্ধ নিয়ম আছে, লক্ষণা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে বলিয়াও তাহাকে ভক্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। অথবা, যদিও লক্ষণা মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া সে কার্যতঃ মুখ্যার্থেরই সেবা করিয়া থাকে; এই কারণেও তাহার 'ভক্তি' নাম সঙ্গত

(গ) পূর্বত্র (কলিঙ্গঃ সাহসিক ইত্যত্র) হেতু রূঢ়িঃ প্রসিদ্ধিরেব। উত্তরত্র 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' ইতি প্রতিপাদনালভ্যস্য শীতত্ব-পাবনত্বাতি-শয়স্য বোধনরূপং প্রয়োজনম্। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ঘ) 'ভজ বিশ্রাণনে'—চুরাদি, 'ভঞ্জো আমর্দনে'—রুধাদি, 'ভজ সেবায়াম্'—ভ্বাদি। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

হইতে পারে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' (গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম) বলিলে গঙ্গা শব্দ গঙ্গাসন্নিহিত তীরকেই বুঝায়; দূরবর্ত্তী স্থান, অথবা গঙ্গা ভিন্ন অন্য নদীর তীরকে বুঝায় না; কাজেই লক্ষণা মুখ্যার্থের সেবা করিতেছে, এরূপ কল্পনা করা অন্যায় নহে। ভক্তি শব্দের এইরূপ নানাবিধ অর্থ কল্পনা করা সম্ভব হইলেও এই স্থলে প্রথমোক্ত অর্থটিকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

উপচার—লক্ষণার আর এক নাম 'উপচার'। 'উপ (সমীপে) চরতি'—এই অর্থে উপ-চর্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। লক্ষণা সকল সময়েই মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে 'মুখ্যার্থের সমীপে বিচরণকারী' বলা চলে। ইহাই উপচার শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি শব্দের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য থাকার ফলে উহাদিগকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করার নামই উপচার (ঙ)। এই মতে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক-সম্মত গৌণী-লক্ষণা বা মীমাংসা-সম্মত গৌণীবৃত্তিই উপচার নামে অভিহিত হইতে পারে; অন্য লক্ষণা নহে। আমরা ঈদৃশ উপচারকে লক্ষণা বলিয়াই স্বীকার করা সঙ্গত

(ঙ) উপচারো হি নামাত্যন্তং বিশকলিতয়োঃ শব্দয়োঃ সাদৃশ্যাতিশয়মহিম্না ভেদপ্রতীতিস্থগনমাত্রম্।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনে করি না। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

লক্ষণার অস্তিত্ব প্রায় সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু ইহার প্রকারভেদ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। মম্মট ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে লক্ষণার ছয়টি মৌলিক ভেদ আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটি আবার অব্যঙ্গ্য, গূঢ়ব্যঙ্গ্য ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্য-ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হওয়ায় লক্ষণাকে মোট ১৮ ভাগে বিভক্ত করা যায় (চ)। ঐ সকল আচার্য্য উল্লিখিত ভেদসমূহের উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্য-প্রকাশের মতানুযায়ী লক্ষণার মৌলিক ভেদ ছয়টি নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

লক্ষণার বিভাগ

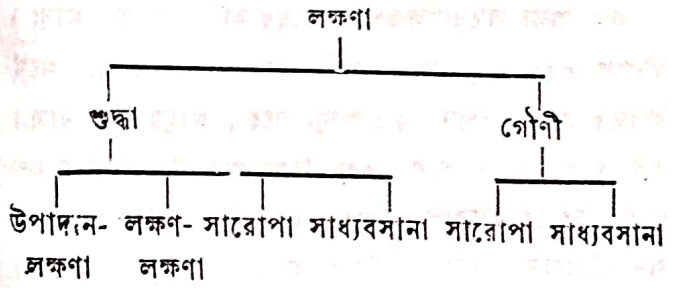

(চ) লক্ষণা তেন ষড়্বিধা।
ব্যঙ্গ্যেন রহিতা রূঢ়ৌ, সহিতা তু প্রয়োজনে।
তচ্চ গূঢ়মগূঢ়ং বা।

(কাব্য-প্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস

১। **উপাদান-লক্ষণা**—'হাঙ্গামার স্থানে লাঠি যাইতেছে' বলিলে লাঠিশব্দে লাঠিধারী পুরুষকে বুঝায়। এই স্থানে লাঠিশব্দ নিজের অর্থকেও পরিত্যাগ করে নাই; অথচ নিজের সহিত যুক্ত পুরুষকেও বুঝাইতেছে। এইভাবে নিজের অর্থের উপাদান (গ্রহণ)-পূর্ব্বক অন্যার্থের প্রতিপাদন উপাদান-লক্ষণার ধর্ম্ম (ছ)।

২। **লক্ষণ-লক্ষণা**—'গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম' বলিলে গঙ্গাশব্দে গঙ্গাতীরকে বুঝায়; কারণ, গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহে কোন গ্রাম থাকা সম্ভব নহে। এইস্থলে গঙ্গাশব্দ নিজের অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অর্থের সহিত যুক্ত অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারই নাম—লক্ষণ-লক্ষণা (জ)

৩। **শুদ্ধা সারোপলক্ষণা**—'আয়ুর্ঘৃতম্' (ঘৃতই আয়ুঃ) বলিলে ঘৃতশব্দ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া আয়ুঃ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ, ঘৃত আয়ুঃ নহে; আয়ুর কারণমাত্র। এই স্থলে বিষয়ী আয়ুঃ এবং বিষয় ঘৃত উভয়েরই উল্লেখ থাকায় ইহাকে সারোপা লক্ষণা বলা হয়। সারোপ-লক্ষণা অর্থ—বিষয়ের (যাহার উপর অন্যার্থের আরোপ হয়)

(ছ) স্বাদাত্মনোঽপ্যুপাদানাদেষোপাদানলক্ষণা।
(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(জ) উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণ-লক্ষণা।
(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

আরোপ-পূর্ব্বক লক্ষণা (ঝ)। আয়ুঃ এবং ঘৃতের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায় মম্মট ভট্ট এই ক্ষেত্রে শুদ্ধা সারোপলক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন (ঞ)

৪। **শুদ্ধা সাধ্যবসান-লক্ষণা**—'আয়ুরেবেদম্' (ইহাই আয়ুঃ) অথবা 'আয়ুরিদম্' (ইহা আয়ুঃ) বলিলে আয়ুঃ শব্দে যখন ঘৃত বা এইরূপ অন্য কোন আয়ুঃজনক পদার্থকে বুঝায়, তখনও আয়ুঃ শব্দে লক্ষণা হয়। এই স্থলে বিষয় ঘৃত প্রভৃতির উল্লেখ নাই, কিন্তু ঘৃত প্রভৃতি পদার্থ এখানে বুদ্ধি-গম্য; এই কারণে ইহাকে সাধ্যবসানা লক্ষণা বলে। এই ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যরূপ গৌণীলক্ষণার হেতু না থাকায় শুদ্ধা লক্ষণা হইল। (শুদ্ধা সারোপলক্ষণার উদাহরণ প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশের উদ্ধৃতি দেখুন।)

৫। **গৌণী সারোপ-লক্ষণা**—'গৌর্বাহীকঃ' (বাহীকটা

(ঝ) সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।
(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—১৪)

আরোপ্যমাণ আরোপবিষয়শ্চ যত্রানপহ্নুতভেদৌ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দিশ্যেতে, সা লক্ষণা সারোপা। (ঐ, ব্যাখ্যা)

(ঞ) ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা।
গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ ··· ··· ॥
(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—১৬)

আয়ুর্ঘৃতম্, আয়ুরেবেদমিত্যাদৌ চ সাদৃশ্যাদন্যৎ কার্য্যকারণভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্। এবমাদৌ চ কার্য্যকারণভাবাদিলক্ষণপূর্ব্বে আরোপাধ্যবসানে। (ঐ, ব্যাখ্যা)

একটা গরু) বলিলে গোশব্দ নিজের মুখ্যার্থ শৃঙ্গলাঙ্গুলাদি-বিশিষ্ট জন্তুবিশেষকে না বুঝাইয়া বাহীককে (বাহীক-দেশীয় লোককে) বুঝাইয়া থাকে। এই স্থলে বাহীক অর্থে গো-শব্দের প্রয়োগ হওয়ার কারণ—উভয়ের গুণগত-সাদৃশ্য। গরু যেমন দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করে (তিষ্ঠন্ মূত্রপুরীষকম্), বাহীক দেশের লোকেরাও তেমনি করিয়া থাকে—এইরূপ বুঝাইবার জন্যই ঈদৃশ প্রয়োগ করা হয় (ট)। এই ক্ষেত্রে গুণ অর্থ সাদৃশ্য। সাদৃশ্যহেতুক লক্ষণা হয় বলিয়া ইহাকে গৌণী-লক্ষণা নামে অভিহিত করা হয়। বিষয় বাহীকেরও উল্লেখ থাকায় ইহা সারোপা-লক্ষণাও বটে।

কাব্য-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে, গরুর মধ্যে যেমন জাড্যমান্দ্যাদি দোষ আছে, বাহীকের মধ্যেও তেমনি এই সকল দোষ আছে—এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য 'গৌর্বাহীকঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে জাড্যমান্দ্যাদিরূপ সাদৃশ্য স্বীকার করা হইয়াছে—এইমাত্র বিশেষ (ঠ)।

(ট) যে তিষ্ঠন্তঃ প্রমেহন্তি যথোষ্ট্রক-দশেরকাঃ। (মহাভারত)

(ঠ) ইমাবারোপাধ্যবসানরূপৌ সাদৃশ্যহেতূ ভেদৌ 'গৌর্বাহীক' ইত্যত্র 'গৌরয়মিত্যত্র চ। অত্র হি স্বার্থ-সহচারিণো জাড্যমান্দ্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গোশব্দস্য পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্ততা-মুপযান্তি—ইতি কেচিৎ। স্বার্থ-সহচারিগুণাভেদেন পরার্থগতা গুণা এব লক্ষ্যন্তে, ন তু পরার্থোঽভিধীয়তে—ইত্যন্যে। সাধারণগুণাশ্রয়ত্বেন পরার্থ এব লক্ষ্যত ইত্যপরে। (কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

'বাহীক' শব্দের অর্থসম্বন্ধেও আবার আচার্য্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন—বাহীক শব্দে দেশবিশেষকে (পঞ্জাব প্রদেশকে) বুঝায়, এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদিগকেও বাহীক বলে। অন্যেরা বলেন—বাহীক শব্দে জাঠ নামক জাতিবিশেষকে বুঝায় (ড)। অপরেরা বলেন—"বহির্ভবো বাহীকঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাহীক শব্দে শাস্ত্রীয়াচার-বহির্ভূত ব্যক্তিকে বুঝায় (ঢ)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে তাঁহার "Indian Æsthetics" নামক গ্রন্থে পঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী অর্থেই বাহীক শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'গৌর্বাহীকঃ'

(ড) পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানামন্তরং যে সমাশ্রিতাঃ।
বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ॥
[মহাভারত, কর্ণপর্ব, (পাতঞ্জলমহাভাষ্যব্যাখ্যায় কৈয়টধৃত)]
পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ।
তান্ ধর্ম্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নগা।
জর্ত্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্॥
[মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ২০০ তম অধ্যায়, (শব্দকল্পদ্রুমধৃত)]

(ঢ) "বহিষষ্টিলোপো যঞ্চ," "ঈকক্ চ" ইতি বার্ত্তিকদ্বয়েন বহিঃশব্দস্য টিলোপে ঈকক্-প্রত্যয়ে চ কৃতে ববয়োরভেদাদ্ বাহীক ইতি রূপমিত্যাহুঃ। (বালবোধিনী)

কথাটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—"This Punjabi is a bull."

বাংলা দেশের কোন কোন অধ্যাপক ভারবাহী অর্থে বাহীক শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে গো এবং বাহীকের মধ্যে জাড্য-মান্দ্যাদিরূপ সাদৃশ্য কল্পিত হওয়ার ফলেই ইঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ, কোন প্রাচীন গ্রন্থেই উক্ত অর্থে বাহীক শব্দের প্রয়োগ না থাকায় এই মতটি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। জাড্য-মান্দ্যাদিগুণ যেমন ভারবাহীর মধ্যে কল্পনা করা যায়, তেমনি বাহীক দেশের লোকের মধ্যেও ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। পঞ্চনদের উপত্যকাভূভাগ পূর্ব্বকালে বর্ত্তমানের চেয়েও অধিকতর উর্ব্বর এবং শস্যসমৃদ্ধ ছিল। এইরূপ স্থানের অধিবাসীরা অল্প পরিশ্রমেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, এবং ফলে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই জাড্যমান্দ্যাদি দোষ জন্মিয়া থাকে।

৬। **গৌণী সাধ্যবসান-লক্ষণা**—'গৌরয়ম্' (এটা একটা গরু) বলিলেও গোশব্দ বাহীক প্রভৃতি অন্যার্থে ব্যবহৃত হওয়ায় লক্ষণা হইল। এইস্থলে বিষয় বাহীক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না থাকায় ইহা সাধ্যবসানা, এবং গো ও বাহীকাদির গুণগত সাদৃশ্যহেতু লক্ষণা হওয়ায় মম্মট ভট্টের মতে ইহা গৌণী লক্ষণাও বটে।

আচার্য্য জয়দেব তাঁহার চন্দ্রালোক নামক গ্রন্থে মম্মট

ভট্টের এই ছয়টি মৌলিক ভেদই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রকারান্তরে অন্যভাবেও লক্ষণা হয় বলিয়া তিনি লক্ষণার মধ্যে আরও কতক-গুলি অবান্তর বিভাগও দেখাইয়াছেন।

জয়দেবের মত

জয়দেব বলেন—শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তাঁহার মতে 'রসসমৃদ্ধ কাব্য অমৃত' বলিলে এইস্থলে অর্থ-বৈশিষ্ট্যহেতু লক্ষণা হয়। অপর পক্ষে 'বিদ্যা সকল ধনের সার' বলিলে শব্দের বৈশিষ্ট্য-হেতু লক্ষণা হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, কাব্য ও অমৃত সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বটে, তথাপি রসসমৃদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তু বা বর্ণনাভঙ্গী অমৃতেরই মত আনন্দদায়ক—এই অর্থে রস-সমৃদ্ধ কাব্যকে অমৃত বলা হয়; অতএব, এক্ষেত্রে কাব্যের অর্থগত বৈশিষ্ট্যই লক্ষণাবৃত্তির হেতু হইল। 'বিদ্যা সকল ধনের সার' বলিলে বিদ্যা শব্দের তাদৃশ কোন অর্থগত বৈশিষ্ট্য বিবক্ষিত হয় না। এই ক্ষেত্রে বিদ্যা শব্দটির মধ্যেই এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার ফলে, তাহাকে সকল ধনের সার বলিতে কাহারও আপত্তি থাকে না। এই জন্য এক্ষেত্রে শব্দগত বৈশিষ্ট্যই লক্ষণা-স্বীকারের হেতু (ণ)।

(ণ) লক্ষ্য-লক্ষ্যকবৈশিষ্ট্য-বৈশিষ্ট্যাদ্ দ্বিবিধা পুনঃ।
সরসং কাব্যমমৃতং বিদ্যা স্থিরতরং ধনম্ ॥
(চন্দ্রালোক, নবম মযূখ, কারিকা—১৪)
লক্ষ্যেতি। তৎকার্য্যকারিত্বসম্বন্ধেনামৃতপদেন বিশিষ্টকাব্যে

জয়দেব আবার সহেতু ও নির্হেতু ভেদে লক্ষণাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'সে সৌন্দর্য্যে কন্দর্প' এই বাক্যে ব্যক্তিবিশেষকে কন্দর্প বলিয়া অভিহিত করার হেতু —তাহার সৌন্দর্য্য। অপর পক্ষে 'তিনি মূর্ত্তিমতী রতি' এই বাক্যে তাদৃশ হেতুভূত শব্দের উল্লেখ্ নাই। প্রথম দৃষ্টান্তে হেতুর উল্লেখ থাকায় জয়দেবের মতে তাহাতে সহেতু-লক্ষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তাদৃশ হেতুর উল্লেখ না থাকায় তাহাতে নির্হেতু-লক্ষণা হইয়াছে (ত)।

জয়দেব বিভিন্নপ্রকার লক্ষণার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার যে দুইটি বিভাগ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবার লক্ষণীয় শব্দের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ দেখিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 'অগ্নির্মাণবকঃ' 'শুক্লো ঘটঃ' প্রভৃতিস্থলে লক্ষণীয় শব্দ 'মাণবক' ও 'ঘট' এর প্রয়োগ আছে; কিন্তু 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'

সুখজনকত্বং লক্ষ্যতে। 'স্থিরতরং ধন'মিতি পদদ্বয়েন চ বিশিষ্টধন-কার্য্যকারিত্বসম্বন্ধেন সুখজনকত্বং বিদ্যায়াম্। তত্র বৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যম্, অত্র বিশিষ্টং লক্ষকমিতি ভেদঃ। ... ...(রাকাগমটীকা)

(ত) তথা সহেতুরতথাভেদভিন্না চ কুত্রচিৎ।
সৌন্দর্য্যেণৈব কন্দর্পঃ সা চ মূর্ত্তিমতী রতিঃ॥
(চন্দ্রালোক, নবম ময়ূখ, কারিকা—১৫)

তথেতি। উদাহরণে সৌন্দর্য্যেণেতি হেতুঃ। সা চেতি দ্বিতীয়োদাহরণম। (ঐ, রাকাগমটীকা)

স্থলে লক্ষণীয় বালকাদি-শব্দের প্রয়োগ নাই।

উল্লিখিত ভেদগুলির প্রত্যেকটি আবার সিদ্ধ, সাধ্য ও সাধ্যাঙ্গ ভেদে ত্রিবিধ। সিদ্ধ = উদ্দেশ্যবাচকপদনিষ্ঠ। সাধ্য = বিধেয়বাচকপদনিষ্ঠ। সাধ্যাঙ্গ = বিধেয়ান্বয়িবাচক-পদনিষ্ঠ। সিদ্ধের উদাহরণ, যথা—'ওরে গর্দ্দভ! তুই বুঝবি না'। এই স্থলে গর্দ্দভ শব্দের উদ্দেশ্যবাচকমূর্খত্বে লক্ষণা হইয়াছে। 'কামিনীবচনামৃত' পদে বিধেয়-বাচক অমৃত পদের আনন্দ-জনকত্বে লক্ষণা এবং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে বিধেয়বাচক গঙ্গাশব্দের গঙ্গাসম্বন্ধিতীরে লক্ষণা হয় (থ)।

(থ) লক্ষণীয়স্য শব্দস্য মীলনামীলনাদ্ দ্বিধা।
লক্ষণা সা ত্রিধা সিদ্ধ-সাধ্য-সাধ্যাঙ্গভেদতঃ॥
(চন্দ্রালোক, নবম ময়ূখ, কারিকা॥—২)

লক্ষণীয়স্যেতি। লক্ষণীয়ার্থবাচকশব্দস্য মীলনং সমভিব্যাহারঃ, অমীলনমসমভিব্যাহারঃ, তেন দ্বিধা। সিদ্ধম্ উদ্দেশ্যম্, সাধ্যং বিধেয়ম্, সাধ্যাঙ্গং বিধেয়ান্বয়ি, তদ্‌বাচকপদনিষ্ঠত্বেন দ্বিধাপি ত্রিধেত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তা দ্বিবিধাপি লক্ষণা লক্ষ্যার্থবাচক-পদসমভিব্যাহৃত-তদসমভিব্যাহৃতপদনিষ্ঠত্বেন দ্বিধা। 'অগ্নির্মাণবকঃ', 'শুক্লো ঘট' ইত্যাদাবাদ্যা। 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তী'ত্যাদৌ দ্বিতীয়েতি। এবং দ্বিবিধাপি উদ্দেশ্যবাচক-পদনিষ্ঠা, বিধেয়বাচকপদনিষ্ঠা, বিধেয়ান্বয়িবাচকপদনিষ্ঠেতি ত্রিধা। যথা—'ভো বৃষ! ন বুধ্যসে' ইত্যাদৌ বৃষপদস্যোদ্দেশ্যবাচিনো মূর্খত্বে, 'কামিনীবচোঽমৃত'মিতি বিধেয়বাচিনোঽমৃতপদস্যানন্দজনকত্বে, 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইত্যাদাবুদ্দেশ্যবিধেয়বাচিবিধেয়ঘোষান্বয়িবাচিনি গঙ্গাপদে ইতি ভাবঃ। (ঐ রাকাগম টীকা)

প্রয়োজনে যে আটটি বিভাগ প্রদর্শিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার তিনি গূঢ়ব্যঙ্গ্যা ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপে প্রাপ্ত প্রয়োজনের ১৬টি বিভাগকে আবার ধর্ম্মিগত ও ধর্ম্মগতভেদে দ্বিধা বিভক্ত করায় প্রয়োজনে লক্ষণা ৩২ প্রকার পাওয়া গেল (ন)।

পূর্ব্বে রূঢ়িতে যে আটটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রয়োজনের এই ৩২টি বিভাগ যোগ করিলে লক্ষণা ৪০ প্রকারের হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার পদগত ও বাক্যগত ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করায় দর্পণকারের

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্ বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥
মুখ্যার্থস্যেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেঽন্বয়সিদ্ধয়ে।
স্যাদাত্মনোঽপ্যপায়ানাদেষোপাদানলক্ষণা॥
অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পরস্যান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণ-লক্ষণা॥
আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।
সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি॥
সাদৃশ্যাত্তু মতা গৌণ্যস্তেন ষোড়শভেদিতাঃ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ন) ব্যঙ্গ্যস্য গূঢ়াগূঢ়ত্বাদ্ দ্বিধা স্যুঃ ফললক্ষণাঃ।
ধর্ম্মি-ধর্ম্মগতত্বেন ফলস্যৈতা অপি দ্বিধা॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

মতে লক্ষণা ৮০ প্রকার (প)।

অপ্পয়দীক্ষিতের মত

আচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার বৃত্তিবার্ত্তিক নামক গ্রন্থে গৌণী ও শুদ্ধাভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইহাদের প্রত্যেকটির আবার নিরূঢ়-লক্ষণা ও ফল-লক্ষণাভেদে দুইটি অবান্তর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন (ফ)।

তাঁহার মতে ফল-লক্ষণা সাত প্রকার; যথা—(১) জহল্লক্ষণা, (২) অজহল্লক্ষণা, (৩) জহদজহল্লক্ষণা, (৪) সারোপা, (৫) সাধ্যবসানা, (৬) শুদ্ধা, এবং (৭) গৌণী। ইহাদের প্রত্যেকটির উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যতিরেক-লক্ষণা জহল্লক্ষণার অন্তর্গত (ব)।

লক্ষণার প্রকারভেদ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের মধ্যে কিছু

(প) তদেবং লক্ষণাভেদাশ্চত্বারিংশন্মতা বুধৈঃ।
পদবাক্যগতত্বেন প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ফ) তস্মাৎ সাদৃশ্যগর্ভ-তদন্যসম্বন্ধনিমিত্ততয়া গৌণী শুদ্ধা চেতি লক্ষণায়া এব দ্বৈবিধ্যম্। ইয়ঞ্চ দ্বিবিধাপি লক্ষণা প্রত্যেকং দ্বিবিধা—নিরূঢ়লক্ষণা, ফললক্ষণা চেতি। রূঢ়িতুল্যতয়া নিরূঢ়লক্ষণা। বিবক্ষিতার্থান্তরদ্যোতনফলা ফল-লক্ষণা। (বৃত্তিবার্ত্তিক)

(ব) জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা, সারোপা, সাধ্যবসানা চ। শুদ্ধা চ গৌণী চ, ইত্যেবং সপ্তবিধা ফললক্ষণা। (বৃত্তিবার্ত্তিক)
ব্যতিরেকলক্ষণাপি জহল্লক্ষণাপ্রভেদ এব। (ঐ)

মতভেদ দেখা যায়। আচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকী প্রভৃতি ভেদে লক্ষণার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে (ভ)।

নৈয়ায়িকদের মত

যে লক্ষণাতে লক্ষক পদ নিজের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপর অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহারই নাম 'জহৎস্বার্থা'। যে লক্ষণাতে লক্ষক পদ নিজের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া বাচ্যার্থের সহিত একযোগে লক্ষ্যার্থকেও বুঝায়, তাহার নাম 'অজহৎস্বার্থা'।

জহৎস্বার্থা = জহতি (পদানি) স্বার্থং যস্যাঃ সা।

অজহৎস্বার্থা = ন জহতি (পদানি) স্বার্থং যস্যাঃ সা।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে, যখন বর্ণবাচক অরুণ শব্দ-দ্বারা অরুণবর্ণবিশিষ্ট কোন পদার্থকে বুঝান হয়, তখন নিরূঢ়-লক্ষণা এবং যখন ঘট প্রভৃতি শব্দদ্বারা পট প্রভৃতিকে বুঝান হয়, তখন আধুনিকী লক্ষণা হইয়া থাকে। কয়েকজন লোক মিলিয়া যদি এমন একটি সাঙ্কেতিক নিয়ম প্রবর্ত্তন করে যে, অতঃপর তাহারা পট অর্থে ঘট শব্দ ব্যবহার করিবে, এবং ইহার পর হইতে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল লোকের নিকট ঘটশব্দে পট-

(ভ) জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থ-নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভির্লক্ষকং স্যাদনেকধা॥
(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—২৫)

পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া জগদীশ তর্কালঙ্কার মনে করেন। ইহাই তাঁহার মতে আধুনিকী লক্ষণার উদাহরণ। আধুনিক লোকদের দ্বারা ঐরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহার নাম আধুনিকী (ম)।

আচার্য্য বিশ্বনাথ পঞ্চানন লক্ষণার মধ্যে মাত্র দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—(১) অজহৎস্বার্থা, এবং (২) লক্ষিতলক্ষণা বা জহৎস্বার্থা। উক্ত দুই প্রকার লক্ষণার উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন (য)।

আচার্য্য জগদীশ ভট্টাচার্য্যও তাঁহার 'তর্কামৃতম্' নামক গ্রন্থে জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা ভেদে লক্ষণার মধ্যে মাত্র দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন (র)।

(ম) কাচিল্লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত-তত্তদ্রূপেণ পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রত্যায়কত্বান্নিরূঢ়া, যথা—আরুণ্যাদি-প্রকারেণ তদাশ্রয়দ্রব্যানুভাবকত্বাদরুণাদিপদস্য। কাচিচ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বং তাদ্রূপ্যেণাপ্রত্যায়কত্বাদাধুনিকী, যথা—ঘটত্বাদিনা পটাদিপদস্য। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

(য) এবং ছত্রিণো যান্তীত্যাদৌ ছত্রিপদস্যৈকসার্থবাহিত্বে লক্ষণা। ইয়মেবাজহৎস্বার্থা লক্ষণেত্যুচ্যতে। একসার্থবাহিত্বেন রূপেণ ছত্রি-তদন্বয়োর্বোধাৎ। ... ...

যত্র তু শক্যার্থস্য পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষণা সা লক্ষিতলক্ষণেত্যুচ্যতে। যথা—দ্বিরেফাদিপদে রেফদ্বয়সম্বন্ধো ভ্রমরপদে জ্ঞায়তে।
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

(র) লক্ষণা দ্বিবিধা—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা চ। (তর্কামৃতম্)

নৈয়ায়িকেরা গৌণী বৃত্তিকে লক্ষণার অন্তর্গত বলিয়াই মনে করেন (ল)।

বেদান্ত-মত

'বেদান্ত-পরিভাষা' নামক গ্রন্থে প্রথমতঃ লক্ষণাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) কেবললক্ষণা, এবং (২) লক্ষিতলক্ষণা। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন—যে স্থলে শক্যার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থলে কেবল-লক্ষণা, এবং যে স্থলে শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধ থাকে, সেইস্থলে লক্ষিত-লক্ষণা হয়। তাঁহার মতে কেবল-লক্ষণার উদাহরণ—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'; এবং লক্ষিত-লক্ষণার উদাহরণ —'দ্বিরেফ' প্রভৃতি শব্দ। তিনি বলেন, গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত গঙ্গাতীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ভ্রমরের সহিত দ্বিরেফ-শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ভ্রমর শব্দে যেমন দুইটি রকার আছে, দ্বিরেফ শব্দেও তেমনি দুইটি রকার বিদ্যমান দেখিয়াই এই পরম্পরা-সম্বন্ধের বলে দ্বিরেফ-শব্দদ্বারা লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে ভ্রমরকে বুঝান হয়। তাঁহার মতে গৌণীলক্ষণা লক্ষিতলক্ষণারই নামান্তর। গৌণী-লক্ষণার উদাহরণ 'সিংহো মাণবকঃ' প্রভৃতি স্থলে সিংহাদি-

(ল) আদিনা শক্যসদৃশত্বপ্রকারেণ বোধকতয়া গৌণ্যুপগৃহ্যতে।
(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ২৫শ কারিকার ব্যাখ্যা)
গৌণীবৃত্তিরপি লক্ষণৈব, যথাগ্নির্মাণবকঃ, গৌর্বাহীকঃ। অত্র লক্ষণয়াগ্ন্যাদিসাদৃশ্যং প্রতীয়তে। (তর্কামৃতম্)

শব্দের সহিত মাণবকাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তিনি মনে করেন (ব)।

উক্ত গ্রন্থকারের মতে, অন্য প্রকারেও লক্ষণাকে তিন-ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) জহল্লক্ষণা, (২) অজহ-ল্লক্ষণা, এবং (৩) জহদজহল্লক্ষণা। ঐগুলির উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। জহল্লক্ষণা, যথা—বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব; অজহল্লক্ষণা, যথা—শুক্লো ঘটঃ; জহদজহল্লক্ষণা, যথা—কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্ (শ)।

মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদান্তিকগণও

(ব) লক্ষণা চ দ্বিবিধা—কেবল-লক্ষণা লক্ষিতলক্ষণা চেতি। তত্র শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধঃ কেবললক্ষণা; যথা—গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র প্রবাহ-সাক্ষাৎসম্বন্ধিনি তীরে গঙ্গাপদস্য কেবললক্ষণা। যত্র শক্য-পরম্পরাসম্বন্ধেনার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্র লক্ষিত-লক্ষণা; যথা—দ্বিরেফপদস্য রেফদ্বয়ে শক্তস্য ভ্রমরপদঘটিতপরম্পরাসম্বন্ধেন মধুকরে বৃত্তিঃ।
গৌণ্যপি লক্ষিতলক্ষণৈব। যথা সিংহো মাণবক ইত্যত্র সিংহ-শব্দবাচ্যসম্বন্ধিক্রৌর্য্যাদিসম্বন্ধেন মাণবকস্য প্রতীতিঃ।
(বেদান্ত-পরিভাষা, আগমপরিচ্ছেদ)

(শ) প্রকারান্তরেণ লক্ষণা ত্রিবিধা। জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা চেতি। তত্র শক্যমনন্তর্ভাব্য যত্রার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্র জহল্লক্ষণা। যথা—'বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব' ইত্যত্র স্বার্থং বিহায় শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তির্লক্ষ্যতে। যত্র শক্যার্থমনন্তর্ভাব্যৈবার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্রা-জহল্লক্ষণা। যথা 'শুক্লো ঘট' ইত্যত্র হি শুক্লশব্দঃ স্বার্থং শুক্লগুণমনন্তর্ভাব্যৈব তদ্বতি দ্রব্যে লক্ষণয়া বর্ত্ততে। (বেদান্ত-পরিভাষা, আগমপরিচ্ছেদ)

লক্ষণার বিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ মতই পোষণ করেন।

আচার্য্য মম্মট ভট্ট লক্ষণা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উক্ত আচার্য্য শুদ্ধা ও গৌণীভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শুদ্ধার মধ্যে চারিটি এবং গৌণীর মধ্যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইভাবে, তাঁহার মতে লক্ষণার মৌলিক ভেদ ছয়টি (লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা)। আচার্য্য মম্মটের মতে সারোপা ও সাধ্যবসানার প্রত্যেকটি শুদ্ধা ও গৌণী ভেদে দুইপ্রকার হইতে পারে বটে, কিন্তু উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণা কেবল শুদ্ধাই হয়; কখনও গৌণী হইতে পারে না। অধিকন্তু, তিনি উপাদান-লক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণার মধ্যে সারোপা ও সাধ্যবসানা ভেদে অবান্তর বিভাগ স্বীকার করেন না।

মম্মটাচার্য্যের এই মত কি সমর্থনযোগ্য? তাঁহার মতে গৌণী ও শুদ্ধার পার্থক্য এই যে, যখন আরোপ্যমাণ ও আরোপবিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ হেতু অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তাহাকে গৌণী-লক্ষণা এবং যখন সাদৃশ্যভিন্ন অন্য সম্বন্ধ হেতু অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তাহাকে শুদ্ধা লক্ষণা বলে। তাঁহার মতে 'গৌর্বাহীকঃ' বলিলে গৌণী সারোপ-লক্ষণা, এবং 'গৌরয়ম্' বলিলে গৌণী সাধ্যবসানলক্ষণা হয়। উল্লিখিত স্থলে গো প্রভৃতি শব্দ 'বাহীক' প্রভৃতিকে

মম্মট ভট্টের মতের সমালোচনা

বুঝাইতেছে বলিয়া লক্ষণা হইল। বাংলাতেও আমরা 'এই কুলিটা একটা আস্ত গাধা' এবং 'ও একটা আস্ত গাধা' এইরূপ বাক্য প্রায়ই শুনিয়া থাকি।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উল্লিখিত স্থলে গো প্রভৃতি শব্দ যখন বাহীক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কি সে উপাদান-লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণার কোনটিতেই পড়ে না? মম্মট ভট্ট নিজেই বলিয়াছেন—যে স্থলে কোন শব্দ স্বসংযুক্ত-অপরার্থের বোধক হয়, সেইস্থলে উপাদান-লক্ষণা এবং যে স্থলে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্থের বোধক হয়, সেইস্থলে লক্ষণ-লক্ষণা হইয়া থাকে; এতদ্‌-ব্যতিরিক্তি অর্থে লক্ষণাই হয় না। উল্লিখিত উদাহরণে গো-শব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বাহীক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিলে লক্ষণ-লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; আর গো-সহচরিত-তিষ্ঠন্মূত্রপুরীষত্বাদি বা জাড্যমান্দ্যাদি গুণের সহিত সংযুক্ত বাহীককে বুঝাইতেছে—এইরূপ বলিলেও উপাদান-লক্ষণা হইয়া পড়ে। অতএব, গৌণী সারোপা বা সাধ্যবসানাস্থলেও উপাদান-লক্ষণা বা লক্ষণলক্ষণা যে কোন একটিকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

মম্মট ভট্ট বলেন—'আয়ুর্ঘৃতম্' বলিলে শুদ্ধা সারোপলক্ষণা এবং 'আয়ুরেবেদম্' বলিলে শুদ্ধা সাধ্যবসানলক্ষণা হয়। এক্ষেত্রেও আয়ুঃ শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই লক্ষণা হইল; সুতরাং পরার্থে

স্বার্থের সমর্পণ করার ফলে লক্ষণ-লক্ষণা হইয়াছে।

উপাদান-লক্ষণার উদাহরণরূপে তিনি 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এই বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কি সারোপা বা সাধ্যবসানা কোনটিরই প্রবেশ হয় না? তিনি নিজেই বলিয়াছেন—যে স্থলে বিষয়ী ও বিষয় (আরোপ্যমাণ ও আরোপ-বিষয়) উভয়েরই উল্লেখ থাকে, সেই ক্ষেত্রে সারোপা, এবং যে স্থলে একটির উল্লেখ থাকে না, সেই-স্থলে সাধ্যবসানা লক্ষণা হইয়া থাকে (ষ)। উল্লিখিত বাক্যে কেবল বিষয় কুন্ত শব্দেরই উল্লেখ আছে, বিষয়ী পুরুষাদির উল্লেখ নাই; অতএব সাধ্যবসানা লক্ষণা হইল। 'এতে কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' বলিলে 'এতে' পদদ্বারা বিষয়ীরও উল্লেখ হওয়ায় সারোপা লক্ষণা হইবে। এইভাবে 'শ্বেতো ধাবতি' বলিলে উপাদান-লক্ষণা সাধ্যবসানা, এবং 'অশ্বঃ শ্বেতো ধাবতি' বা 'অয়ং শ্বেতো ধাবতি' বলিলে উপাদান-লক্ষণা সারোপা হইবে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই মম্মট-প্রদর্শিত লক্ষণ-লক্ষণার উদাহরণে বিষয়ীর উল্লেখ না থাকায় সাধ্য-বসানা এবং 'অস্যাং গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে বিষয়ীরও উল্লেখ থাকায় সারোপা লক্ষণা হইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মম্মটা-

(ষ) সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।
বিষয্যন্তঃকৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাং সাধ্যবসানিকা॥
(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

চার্য্যের মূলনীতি অনুসারে উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণা গৌণীও হইতে পারে, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি আবার সারোপা ও সাধ্যবসানাভেদে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত আচার্য্যের 'লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা' কথাটি আমরা কি ভাবে সমর্থন করিতে পারি?

বস্তুতঃ, গৌণী নামে লক্ষণার মধ্যে অবান্তর বিভাগ স্বীকার করা যে আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক, উপক্রম-ণিকাতেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিতেছি। 'গৌর্বাহীকঃ' বা 'গৌরয়ম্' বলিলে যে গো-শব্দ গো-সহচরিত-জাড্যমান্দ্যাদি-সদৃশ-জাড্যমান্দ্যাদিবিশিষ্ট বা তিষ্ঠন্মূত্রপুরীষত্বাদিগুণসদৃশ-গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা কি লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে? গো-শব্দের শক্যার্থ—শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট জন্তুবিশেষ। এই অর্থটি বাহীক-শব্দার্থের সহিত অন্বিত না হওয়ায় দ্বিতীয় কক্ষায় অর্থপ্রকাশের জন্য লক্ষণাবৃত্তির প্রবেশ ঘটিল। লক্ষণা মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত অর্থমাত্রই প্রতিপাদন করিতে পারে, ইহার অতিরিক্ত নহে;—এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই ক্ষেত্রে গোশব্দ লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে 'গোসহচরিতজাড্যমান্দ্যাদি' বা 'তিষ্ঠন্মূত্রপুরীষত্বাদি' ধর্ম্মকেই বুঝাইতে পারিল। কিন্তু এই অর্থটিও বাহীকশব্দার্থের সহিত অন্বিত না হওয়ায় তৃতীয় কক্ষায় 'গোসহচরিতজাড্য-

মান্দ্যাদিসদৃশজাড্যমান্দ্যাদিবিশিষ্ট' বা 'গোসহচরিততিষ্ঠন্মূত্র-পুরীষত্বাদিগুণসদৃশ-গুণবিশিষ্ট'রূপ অর্থ প্রতিপাদনের জন্য তৃতীয় আর একটি বৃত্তির প্রবেশ ঘটিল। ইহাই মীমাংসা-সম্মত গৌণীবৃত্তি। লক্ষণা দ্বিতীয় কক্ষায় অর্থ প্রতিপাদন করিয়া বিরত হয়, এবং তৃতীয় কক্ষায় আর তাহার প্রবেশ ঘটে না; কাজেই এই গৌণীবৃত্তি লক্ষণা নহে। গুণ অর্থ সাদৃশ্য, একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সাদৃশ্য-সম্বন্ধ যে পদ-পদার্থ-প্রতিপাদনে প্রতিভাসমান হয় না, কেবলমাত্র ঔপম্যাদিপ্রতিপাদনের সময়েই প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, ইহাও অনুভবসিদ্ধ; অতএব, অবশ্য স্বীকার্য্য। সাদৃশ্য-সম্বন্ধ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু উক্ত অলঙ্কারসমূহ যে ব্যঞ্জনা-বৃত্তিলভ্য, তাহা সকল আলঙ্কারিকই স্বীকার করিয়াছেন।

'মুখচন্দ্রং চুম্বতি' বলিলে যেমন 'গগনস্থ জ্যোতিষ্কবিশেষ'-রূপ অর্থ বুঝাইয়া চন্দ্র শব্দের অভিধা, এবং 'চন্দ্রগত লাবণ্যাদি' রূপ অর্থ প্রতিপাদন করিয়া লক্ষণা বিরত হইলে পর 'চন্দ্রগত-লাবণ্যাদিসদৃশ-লাবণ্যাদিযুক্ত'রূপ সাদৃশ্য-বোধক অর্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে প্রতিপাদিত হইয়া উপমালঙ্কার সৃষ্টি করে, 'গৌর্বাহীকঃ' প্রভৃতি উদাহরণেও তেমনি সাদৃশ্যবোধক অর্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যেই পাওয়া যাইতেছে। বিশেষত্ব এই যে, এক্ষেত্রে সাদৃশ্য বাচ্য না

হইয়া ব্যঙ্গ্য হওয়ায় উপমালঙ্কারটি ধ্বনিত হইতেছে। 'কদলী কদলী' প্রভৃতি স্থলে যেমন দ্বিতীয় কদলী শব্দ 'কদলীগত জাড্যমান্দ্যাদির আতিশয্যযুক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনি হইয়াছে বলিয়া মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন, এখানেও তেমনি 'গৌঃ' পদটি 'গোসহচরিতজাড্যমান্দ্যাদিতুল্যজাড্যমান্দ্যাদির আতিশয্য-যুক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনি হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত।

মম্মটাচার্য্য যে অব্যঙ্গ্যা, গূঢ়ব্যঙ্গ্যা এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যাভেদে লক্ষণাকে পুনরায় বিভক্ত করিয়াছেন, ইহাও আমাদের মনঃ-পূত হইতেছে না। আমরা চলিতে চাই যে, লক্ষণা কেবল অব্যঙ্গ্যাই হইবে। গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে ধ্বনি এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে যে কোন একটী অলঙ্কার হইয়া থাকে—একথা মম্মটভট্টও স্বীকার করিয়াছেন। অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য স্বীকার করিয়া ইহার অবান্তর বিভাগও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, ধ্বনি এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য ছাড়া গূঢ় ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্যের এমন স্থল কোথায় আছে যে, তাহাতে লক্ষণা স্বীকার করিব? ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্য ছাড়া পাওয়া যায় না। লক্ষণা নিবৃত্ত হইলেই ব্যঞ্জনার প্রবেশ হইয়া থাকে। অতএব, যে স্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে অর্থবোধ হইতেছে, স্বীকার করিতে হইবে যে, সেখানে অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশে লক্ষণার সামর্থ্য নাই। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার একত্র

অবস্থিতি যদিও বা সম্ভব হয়, তথাপি, সেই ক্ষেত্রে 'প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তি'—এই ন্যায় অনুসারে ব্যঙ্গ্যার্থেরই গ্রহণ হইবে, লক্ষিতার্থের নহে। অতএব, কোন অবস্থায়ই ব্যঙ্গ্যার্থস্থলে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

কোন কোন স্থলে লক্ষণা ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশে সহায়তা করে—স্বীকার করিলেও লক্ষণাকে গূঢ়ব্যঙ্গ্যা বা অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা নামে অভিহিত করা চলে না; কারণ, ঐরূপ স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থই প্রধান থাকে। অধিকন্তু, ঐরূপ কারণে ভেদ কল্পনা করিতে হইলে, অভিধার মধ্যেও তাদৃশ ভেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আচার্য্য মম্মট তাহা করেন নাই।

যদিও মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'লক্ষণামূলা-ব্যঞ্জনা' নামে ব্যঞ্জনার একটি পৃথক্ বিভাগ স্বীকার করিয়া লক্ষণাকে ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপাদনের অন্যতর কারণরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়েও আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। আমি বলিতে চাই যে, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। উল্লিখিত আচার্য্যগণ তাঁহাদের স্বীকৃত লক্ষণামূলাব্যঞ্জনাকে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য মম্মট অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য-লক্ষণামূল-ধ্বনির উদাহরণরূপে—

"ত্বামস্মি বচ্মি বিদুষাং সমবায়োঽত্র তিষ্ঠতি।
আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ।"

এই শ্লোকটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এইস্থলে 'বচ্মি' পদটি 'উপদেশ দিতেছি' অর্থ প্রকাশ করায় এই লক্ষ্যার্থের সাহায্যে উক্তরূপ ধ্বনি হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই শ্লোকে সমগ্র বাক্যের বাচ্যার্থ উপলব্ধির পর 'বুঝিয়া শুনিয়া চলিবে', 'নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিবে', 'ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিবে', 'পণ্ডিতগণের অবমাননা করিবে না', এইরূপ যে কোন একটি অর্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা বাচ্যার্থের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব বহন করিতেছে বলিয়া ধ্বনি হইয়াছে। 'বচ্মি' পদে বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ যাহাই বুঝায় না কেন, তাহাতে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের কোন উপকার হইতেছে না। 'পণ্ডিত-গণ এখানে আছেন'—এই সংবাদের শ্রবণই শ্রোতার সতর্ক হওয়ার হেতু। ইহা সংবাদমাত্ররূপে জানিলেই উল্লিখিত ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মাইবে। কাজেই, এই ক্ষেত্রে 'বচ্মি' পদের 'উপদিশামি' অর্থ কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই। 'বচ্মি' পদটি অভিধাবৃত্তির সাহায্যেই পণ্ডিতগণের উপস্থিতি দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিতে পারে, এবং দিতেছেও বটে। কাজেই, বস্তুতঃ এখানে লক্ষণাই হয় নাই।

আচার্য্য-মম্মট-প্রদর্শিত অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য-লক্ষণামূল-ধ্বনির উদাহরণ 'উপকৃতং বহু তত্র—' ইত্যাদি শ্লোকেও যে বস্তুতঃ লক্ষণার প্রবেশই হয় নাই, তাহা সাহিত্যদর্পণের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রদর্শন করা হইবে।

কাব্যপ্রকাশকার রূঢ়ি-লক্ষণার উদাহরণে যে 'কর্ম্মণি কুশলঃ' এই বাক্যটি দিয়াছেন, বস্তুতঃ এইস্থলে লক্ষণাই হয় নাই বলিয়া সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। কুশল শব্দটির ব্যুৎপত্ত্যর্থ প্রসিদ্ধ নহে, তাহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত দক্ষরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ, এবং এই অর্থই মুখ্য। কাজেই, উক্ত স্থলে বাচ্যার্থেরই গ্রহণ হইয়াছে; লক্ষ্যার্থের নহে।

রূঢ়ি অর্থ প্রসিদ্ধি। যে শব্দ যে অর্থে রূঢ় বা প্রসিদ্ধ, সেই অর্থটিকে তাহার মুখ্যার্থই মনে করিতে হইবে। অতএব, সকল ক্ষেত্রেই রূঢ়ার্থে লক্ষণা স্বীকার করা আমাদের মতে অযৌক্তিক।

মম্মট ভট্টের উপরোক্ত মতসমূহ খণ্ডনের দ্বারা আচার্য্য জয়দেবেরও অনুরূপ মতসকল খণ্ডিত হইল। ইহা ছাড়া জয়দেব লক্ষণার মধ্যে অন্যান্য যে সকল অবান্তরবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, আমার মতে, তাহা অনাবশ্যক এবং তাহাদের অনেক স্থলে বস্তুতঃ লক্ষণার অস্তিত্বই নাই। প্রথমতঃ, অতি নগণ্য ভেদ দেখিয়াই যদি লক্ষণাকে বিভক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিভাগ অসংখ্য হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, জয়দেব অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া বস্তুতঃ ব্যঞ্জনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

জয়দেবের মতের সমালোচনা

শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লক্ষণার দুইটি ভেদের

কথা বলিয়া তিনি ঐগুলির যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কি বস্তুতঃ লক্ষণা আছে? জয়দেবের মতে 'রসসমৃদ্ধ কাব্য অমৃত' বলিলে অর্থবৈশিষ্ট্যহেতু লক্ষণা হয়। আমরা কিন্তু দেখিতেছি—অর্থ-বৈশিষ্ট্যহেতু উক্ত স্থলে রূপকালঙ্কার হইয়াছে। ইহা একটি অর্থালঙ্কার এবং ব্যঞ্জনা-বৃত্তির সাহায্যেই ইহাকে পাওয়া যায়। উল্লিখিত বাক্যে বস্তুতঃ কাব্য অমৃত অর্থে বা অমৃত কাব্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু কাব্য ও অমৃতের সামান্যাধিকরণ্য হয় না দেখিয়া 'অমৃতের মধ্যে যেমন আনন্দজনকত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, রসসমৃদ্ধ কাব্যের মধ্যেও তাহা তেমনি আছে' এইরূপ উপমাগর্ভ অর্থের প্রতীতি হয়। তারপর এই উপমালঙ্কারের সহায়ক উপমান ও উপমেয়রূপ বস্তুদ্বয়কে অভিন্নরূপে কল্পনা করায় "উপমেয়স্য তিরোহিতভেদা রূপক-মুচ্যতে"—এই নিয়ম অনুসারে রূপকালঙ্কাররূপে তাহার গ্রহণ হইল। এই উপমা বা রূপকালঙ্কার বুঝাইবার সামর্থ্য স্বয়ংযুক্তার্থবোধয়িত্রী লক্ষণার নাই; কাজেই এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনারই শরণাপন্ন হইতে হয়। এইরূপে অর্থবৈচিত্র্য থাকিলেই ব্যঞ্জনা হইবে; কাজেই তাদৃশস্থলে লক্ষণা বলা অযৌক্তিক।

শব্দবৈশিষ্ট্যেও তুলক্ষণা হয় সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষণাতে এই শব্দবৈশিষ্ট্য থাকে বলিয়া ইহাকে আর পৃথক্‌ভাবে দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। অধিকন্তু, জয়দেব শব্দবৈশিষ্ট্যে

লক্ষণার উদাহরণরূপে 'বিদ্যা স্থিরতরং ধনম্'—এই যে বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য-রূপকালঙ্কার হইয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তিরই অনুকূলে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সহেতু এবং নির্হেতুভেদে লক্ষণার দুইটি অবান্তর বিভাগ দেখাইতে গিয়া জয়দেব যে দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও বস্তুতঃ লক্ষণা না হইয়া ব্যঞ্জনাই হইয়াছে। 'সে সৌন্দর্য্যে কন্দর্প' এবং 'তিনি মূর্ত্তিমতী রতি' এই উভয় স্থলেই 'সিদ্ধত্বে অধ্যবসায়'রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে, এবং ইহাও ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যেই পাওয়া যাইতেছে, লক্ষণার সাহায্যে নহে।

লক্ষণীয় শব্দের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ দেখিয়া জয়দেব লক্ষণার অপর যে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে সারোপা ও সাধ্যবসানারই নামান্তর। সিদ্ধ, সাধ্য ও সাধ্যাঙ্গ ভেদে তিনি অপর যে তিনটি অবান্তর বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ পার্থক্য এতই অল্প যে, ইহার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করা আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক। প্রয়োজনকে 'স্ফুট' ও 'অস্ফুট' ভেদে দুই প্রকার কল্পনা করিয়া এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার শব্দনিষ্ঠ ও অর্থনিষ্ঠভেদে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া জয়দেব লক্ষণার যে সকল অবান্তর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা পার্থক্য এতই অল্প দেখিতেছি যে, এই

কারণে পৃথক্ বিভাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না; এত অল্প কারণে ভেদ অঙ্গীকার করিলে, ভেদকল্পনার নূতন নূতন হেতু উপস্থিত হইয়া অনন্ত-কল্পনা-গৌরবে পর্য্যবসিত হইবে।

আচার্য্য বিশ্বনাথ রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মম্মটাচার্য্য যদিও উক্ত কারণে লক্ষণার মধ্যে অবান্তর বিভাগ কল্পনা করেন নাই, তথাপি লক্ষণা উক্ত দুই প্রকারেই হয়—এই কথাটি তিনিও বলিয়াছেন। আচার্য্য বিশ্বনাথ মম্মটাচার্য্যের উদাহরণে দোষ দিয়া নিজে স্বতন্ত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এইমাত্র বিশেষ। প্রয়োজনরূপ হেতু অবলম্বন করিয়া যে লক্ষণা হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু রূঢ়িহেতু অবলম্বনে লক্ষণার স্বীকার বা ভেদকল্পনা আমাদের মতে সঙ্গত নহে। এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। সম্প্রতি সাহিত্য-দর্পণোক্ত উদাহরণের আলোচনা করিতেছি।

সাহিত্যদর্পণের মতের আলোচনা

বিশ্বনাথ বলেন—'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ' বলিলে যখন কলিঙ্গশব্দ কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষকে বুঝায়, তখন সেখানে কোন প্রয়োজন না থাকায় রূঢ়িবশতঃই লক্ষণা হইয়া থাকে। ইহা কি ঠিক? হেতু ছাড়া কোন কার্য্য হয় না—দার্শনিকমাত্রেই এই কথা স্বীকার করেন। উক্ত

স্থলে পুরুষটির কলিঙ্গদেশবাসিত্ববোধনরূপ প্রয়োজন আছে বলিলে তাহা কি অসঙ্গত হইবে? আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—কলিঙ্গ শব্দটি প্রসিদ্ধ দেশবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া যে ঐ দেশবাসী পুরুষ অর্থে প্রযুক্ত হইল, তাহার হেতু কি? যদি বলা হয়, সাহসিক শব্দের সহিত অন্বয় না হওয়াই ঐরূপ অর্থবোধনের হেতু, তাহা হইলেও আমরা বলিব—তবে কলিঙ্গশব্দ কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষকে না বুঝাইয়া মগধ বা পঞ্চালদেশবাসী পুরুষকে বুঝায় না কেন? বস্তুতঃ, ঐ পুরুষটির কলিঙ্গদেশবাসিত্ব-বোধনরূপ অথবা দেশান্তরবাসিত্বব্যাবর্তনরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়াই কলিঙ্গশব্দটি উল্লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষ যখন কলিঙ্গেই থাকে, এবং অন্য-দেশবাসী লোক হইতে তাহার পার্থক্য বুঝাইবার কোন প্রয়োজন না থাকে, তখন 'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ' এইরূপ বাক্যেরই প্রয়োগ হয় না। রুচিতে উপাদানলক্ষণার উদাহরণে বিশ্বনাথ যে 'শ্বেতো ধাবতি' এই বাক্যটি দিয়াছেন, তাহাতেও বস্তুতঃ প্রগাঢ়শ্বেতবর্ণবিশিষ্টত্ববোধনরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। এইভাবে 'ভারত যুদ্ধে যোগদান করে নাই' বলিলে 'যুধ্যমান অন্যান্য দেশ হইতে ভারতের পার্থক্য প্রতিপাদন'রূপ প্রয়োজন এখানেও থাকে। এইরূপে অন্যান্য স্থানেও লক্ষণা হইলে তাহার হেতুরূপে একটি প্রয়োজন পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাদের বিবেচনায় রুঢ়ি

ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার ভেদস্বীকার কেবল অনাবশ্যকই নহে, অসঙ্গতও বটে।

আচার্য্য বিশ্বনাথ গূঢ়ব্যঙ্গ্যা ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা ভেদে প্রয়োজনগত লক্ষণার যে দুইটি অবান্তর বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কাব্য-প্রকাশের আলোচনা প্রসঙ্গেই খণ্ডিত হইয়াছে। গূঢ়ব্যঙ্গ্যার উদাহরণে আচার্য্য বিশ্বনাথ,

"উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে
সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে!
সুখিতমাস্স্ব'তঃ শরদাং শতম্॥"

এই শ্লোকটি প্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষণ-লক্ষণার উদাহরণ-রূপেও তিনি এই শ্লোকটি দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই শ্লোকে লক্ষণা নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আচার্য্য মম্মট কাব্যপ্রকাশের চতুর্থোল্লাসে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির উদাহরণ-রূপে এই শ্লোকটিই প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য মম্মটাচার্য্যের মতে এইস্থানে লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা হইয়া ধ্বনির উৎপত্তি হইয়াছে। বিশ্বনাথও এই স্থানে বিপরীতলক্ষণা বলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—'উপকৃতং বহু তত্র' ইত্যাদি শ্লোকে 'উপকৃত' প্রভৃতি শব্দ যে অপ-কারাদি বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইল, তাহাতে লক্ষণার নিয়ামক মুখ্যার্থবাধাদি হেতুত্রয় আছে কি? মুখ্যার্থবাধ এবং অন্যার্থবোধ আছে সত্য, কিন্তু মুখ্যার্থের সহিত যোগ

কোথায়? উল্লিখিত দুইটি হেতু তো ব্যঞ্জনাতেও থাকে। মুখ্যার্থের সহিত যোগ না থাকিলে লক্ষণা হয় না বলিয়া মম্মট ও বিশ্বনাথ নিজেরাই যদি আবার ইহার বিপরীতস্থলে লক্ষণা কল্পনা করেন, তবে তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা কি ব্যাহত হয় না? গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে ধ্বনি এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা অলঙ্কারাদি হয় বলিয়া দর্পণকার নিজেও চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্বীকার করিয়াছেন।

গূঢ়ব্যঙ্গ্যের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—বাক্যার্থের ভাবনাদ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, কেবলমাত্র তাদৃশ ব্যক্তিরাই যে ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝিতে পারেন, তাহাই গূঢ় (স)। ঈদৃশস্থলে যে গূঢ়ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা খুবই সত্য কথা; কিন্তু এবংবিধ গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে লক্ষণা হয় কি প্রকারে? বাক্যার্থভাবনাপরিপক্কবুদ্ধিবিভবমাত্রবেদ্য অর্থ-মাত্রেই লক্ষণা স্বীকার করিলে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির স্বীকৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে সমুদয় ধ্বনি, সমুদয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য এবং সমুদয় অলঙ্কার লক্ষণারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

শাব্দিকগণ বলেন—লক্ষণা হয় পদে, বাক্যে নহে।

(স) ব্যঙ্গ্যস্য গূঢ়াগূঢ়ত্বাদ্ দ্বিধা স্যুঃ ফললক্ষণাঃ।
(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কারিকা—১০)
তত্র গূঢ়ো বাক্যার্থভাবনাপরিপক্কবুদ্ধিবিভবমাত্রবেদ্যঃ।
(ঐ ব্যাখ্যা)

বাচ্যার্থবোধের পর লক্ষণার জ্ঞান হয়—এমন নিয়মও করা চলে না; কারণ, ব্যঞ্জনাও বাচ্যার্থবোধের পরেই হইয়া থাকে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আচার্যগণ লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার ভেদ বুঝাইবার জন্য "অন্বয়ানুপপত্তির্হি লক্ষণাবীজম্" এই কথাটি বলিয়াছেন। যখন বাক্যস্থিত কোন পদের অন্যান্য পদের সহিত অন্বয় সঙ্গত হয় না, তখন অন্যান্য পদের সহিত সেই পদটিকে অন্বিত করিবার জন্যই লক্ষণা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পদসমূহের মধ্যে যখন অন্বয়ের কোন বাধা থাকে না, কেবলমাত্র অবস্থাদি-পর্য্যালোচনায় বা কাকু-প্রভৃতি-বশতঃ বাক্য বা বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই স্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। 'উপকৃতং বহু তত্র' ইত্যাদি শ্লোকে অন্বয়ের কোন বাধা হইতেছে না। কেবল-মাত্র কাকুবশতঃ উপকৃতাদিশব্দ বিপরীতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যার্থগ্রহণে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা কেবলমাত্র মুখ্যার্থেও এই শ্লোকটিকে অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন। উপকারীর দীর্ঘজীবন কামনা করা যেমন অসঙ্গত নহে, তেমনি তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে উপকারের প্রত্যাশা করাও অন্যায় নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উল্লিখিত শ্লোকে অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় নাই; কাজেই লক্ষণাও এই স্থলে স্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ, এইস্থলে ব্যঞ্জনাই হইয়াছে, এবং সেই ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ বাচ্যার্থের চেয়ে

অধিকতর মনোরম বলিয়া এইস্থলে ধ্বনি স্বীকার করাই সমীচীন। এখানে ধ্বনিকে লক্ষণামূলক বলিবারও কোন হেতু নাই; কারণ, 'অন্বয়ানুপপত্তি'রূপ হেতু না থাকায় উক্ত শ্লোকে বা শ্লোকস্থ পদসমূহে লক্ষণার প্রবেশ হয় নাই।

অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা লক্ষণার উদাহরণে আচার্য্য বিশ্বনাথ—

'উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি।'

এই উদাহরণটি দিয়া বলিয়াছেন যে, এইস্থানে 'উপদিশতি' পদ 'আবিষ্করোতি' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণা হইল। তাঁহার এই যুক্তি আমি মানিয়া লইতে পারি না। যৌবনমদ অচেতন পদার্থ বলিয়া যেমন তাহার উপদেশ দেওয়ার সামর্থ্য নাই, তেমনি আবিষ্কার করারও সামর্থ্য নাই। অতএব বাক্যের মুখ্যার্থচিন্তনের পর 'যৌবনমদজনিত ললিত কামিনীগণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে' এই অর্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে পাওয়া গেল। কেবলমাত্র 'উপদিশতি' পদের যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, 'যৌবনমদ' এই কর্তৃপদের সঙ্গে তাহার সুষ্ঠু অন্বয় হইবে না; কাজেই অর্থবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়াই শাব্দবোধ করিতে হইবে। এ স্থলে অন্বয়ের উপপত্তি হয় নাই, বলা চলে না; কারণ, অচেতন যৌবনমদের মধ্যে চৈতন্যের কল্পনা করিয়া অনায়াসেই অন্বয়ের উপপত্তি করা যায়। মোট কথা, যে স্থলে অর্থের মধ্যে বৈচিত্র্য

নাই, সেই স্থলেই অন্বয়ের অনুপপত্তি স্বীকার করা হয়; অর্থবৈচিত্র্য থাকিলে তখন আর অন্বয়ানুপপত্তি স্বীকৃত হয় না। ফলে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যহেতু সৃষ্ট অলঙ্কারসমূহে কোথাও লক্ষণা নাই, সর্ব্বত্রই ব্যঞ্জনা প্রবেশ করিয়াছে—এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত। 'উপদিশতি ...' ইত্যাদি শ্লোকেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যই আছে, এবং ইহা ব্যঞ্জনাবৃত্তিলভ্য; লক্ষণালভ্য নহে।

ফলের ধর্ম্মিগতত্ব ও ধর্ম্মগতত্ব কল্পনা করিয়া আচার্য্য বিশ্বনাথ লক্ষণার মধ্যে যে দুইটি অবান্তরবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার মতে অনাবশ্যক। ফল ধর্ম্মিগতই হউক বা ধর্ম্মগতই হউক, তাহাতে লক্ষণার কোনরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয় না; এবং এইরূপ ভেদকল্পনা-দ্বারা লক্ষণার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যও প্রকট হয় না। এইরূপ সামান্য কারণে ভেদ কল্পনা করিলে ধর্ম্মীর আবার স্ত্রী-পুং-নপুংসকাদিভেদ, তাহার আবার ধীরোদাত্তাদি এবং মুগ্ধামধ্যাদিভেদ, ইহাদের আবার স্বীয়-পরকীয়াদিভেদ, এইরূপ অনন্তকল্পনাগৌরবের হেতু-উপজাত হয়। ধর্ম্মের মধ্যেও এইভাবে উৎকর্ষ-অপকর্ষাদি নানারূপ ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, লক্ষণার মধ্যে ইহাদের কোন উপকারিতা নাই দেখিয়া আমরা এইরূপ অবান্তরবিভাগ স্বীকার করিতে চাহি না।

পদগত এবং বাক্যগতভেদে আচার্য্য বিশ্বনাথ লক্ষণার

যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা তাঁহার সহিত একমত নহি। আমরা এই বিষয়ে নৈয়ায়িকদের সহিত একমত যে, লক্ষণা কেবল পদেই হইতে পারে, বাক্যে নহে। 'উপকৃতং বহু তত্র—'ইত্যাদি শ্লোকরূপ-বাক্যে যে লক্ষণার প্রবেশ হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

অপ্পয়দীক্ষিতের মতের সমালোচনা

আচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিত যে গৌণী ও শুদ্ধা ভেদে লক্ষণার দুইটি প্রাথমিক বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গৌণী-স্থলে যে লক্ষণাই হয় না, তাহা উপক্রমণিকাতেই আলোচিত হইয়াছে এবং কাব্য-প্রকাশের আলোচনা-প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি যে রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে রূঢ়ার্থে যে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় না, তাহাও কাব্যপ্রকাশের আলোচনাপ্রসঙ্গেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচার্য্য দীক্ষিতের প্রদর্শিত ফলগত সাত প্রকার লক্ষণার মধ্যে জহদজহল্লক্ষণা নামে পৃথক্ লক্ষণা স্বীকার করা আমরা সমীচীন মনে করি না। উক্ত আচার্য্যের মতে, গ্রামের একদেশ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া যখন 'গ্রামো দগ্ধঃ' অথবা বনের একদেশ পুষ্পিত হইয়াছে দেখিয়া 'পুষ্পিতং বনম্' বলা হয়, তখন গ্রামাদি শব্দ একাংশ পরিত্যাগ করিয়া এবং অপরাংশ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থ-প্রতিপাদন করে বলিয়া ঐ সকল স্থলে জহদজহল্লক্ষণা হয়। (হ)

আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল স্থলে গ্রামাদিশব্দ অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। গ্রামের একদেশ গ্রামকে ছাড়িয়া নহে; কাজেই, গ্রামশব্দে গ্রামের একদেশ বুঝার পক্ষে কোন বাধা নাই। কোন ব্যক্তির দেহের একাংশে কুষ্ঠব্যাধি হইলে যেমন তাহার দেহ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে—বলা হয়, অথবা বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন হইলে বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে—বলা হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি।

অবশিষ্ট ছয়প্রকারের মধ্যে গৌণীস্থলে যে আমরা লক্ষণাই স্বীকার করি না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাকী পাঁচটিকে তিনি যেমন পরস্পর-নিরপেক্ষ মনে করেন, আমরা সেইরূপ মনে করি না; এই মাত্র প্রভেদ। তাঁহার স্বীকৃত জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা বস্তুতঃ লক্ষণ-লক্ষণা ও উপাদানলক্ষণারই নামান্তর। যে স্থলে লক্ষক শব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থ বুঝায়, সেইস্থলে জহল্লক্ষণা এবং যে স্থলে স্বার্থের সহিত অন্যার্থ বুঝায়, সেই স্থলে অজহল্লক্ষণা হয় বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন

নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে সাধারণতঃ জহৎস্বার্থা ও অজহৎ-

(হ) গ্রামৈকদেশদাহাদৌ সতি 'গ্রামো দগ্ধঃ' 'পুষ্পিতং বনম্' ইত্যাদি প্রয়োগে গ্রামাদিপদস্য স্বার্থৈকদেশপরিত্যাগেন তদেকদেশে বৃত্তের্জহদজহল্লক্ষণা, দগ্ধভূয়স্ত্বাদিদ্যোতনং ফলম্। [বৃত্তিবার্ত্তিক]

স্বার্থা নামে যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে লক্ষণলক্ষণা এবং উপাদানলক্ষণারই নামান্তর। নৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার নিরূঢ়া ও আধুনিকীভেদে অপর যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। নিরূঢ়া অর্থ—প্রসিদ্ধা। প্রসিদ্ধ অর্থে যে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় না, তাহা কাব্যপ্রকাশের আলোচনা প্রসঙ্গেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অরুণ শব্দে যখন অরুণবর্ণবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, তখন যদি অরুণশব্দের লাক্ষণিক অর্থই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে রূঢ়ি বা নিরূঢ়িরূপ হেতু কল্পনা না করিয়া বরং প্রয়োজনরূপ হেতু কল্পনা করাই সমীচীন। বস্তুতঃ, প্রয়োজন-ব্যতিরেকে লক্ষণাই হয় না; কাজেই, ঈদৃশস্থলে কোনরূপ পৃথক্ বিভাগ স্বীকার করা অনাবশ্যক। জগদীশ তর্কালঙ্কারের প্রদর্শিত আধুনিকী লক্ষণার উদাহরণটি দেখিয়া আমাদের মনে হয়, এই উদাহরণটিই দুষ্ট। 'ইহা ঘট' বলিলে 'ইহা পট' ইত্যাকার জ্ঞান হওয়ার কল্পনা আমাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এতাদৃশ জ্ঞান কোথাও হয় বলিয়া আমরা অনুভব করি না। উচ্ছিষ্টপত্র মস্তকে ধারণ করতঃ তাহাকে রাজচ্ছত্ররূপে কল্পনা করিয়া যদি কেহ বলে 'আমি এই দেশের রাজা,' তাহা হইলে, তাহার উক্তি যেমন শুনায়, ঘট শব্দদ্বারা পটপদার্থের প্রতিপাদনের

জগদীশমতের সমালোচনা

কল্পনাকেও আমরা সেই পর্য্যায়েরই মনে করি। যাঁহারা চক্রবাক অর্থে রথাঙ্গনামন্ শব্দের প্রয়োগটিকে আধুনিকী লক্ষণার উপযুক্ত উদাহরণ মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আমি একমত নহি। আমার বিবেচনায় 'রথাঙ্গনামন্' শব্দ অভিধাবৃত্তির সাহায্যেই চক্রবাকরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। আমার এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত অভিধানটি প্রদর্শন করিতেছি; যথা—

"কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকো রথাঙ্গাহ্বয়-নামকঃ"।

(অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)

বেদান্ত-পরিভাষা-নামক গ্রন্থে যে ভাবে কেবললক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা নামে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহা অসঙ্গত। কেবল-লক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণানামে দুইটি বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে, তাহাদিগকে যথাক্রমে উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণার স্থলবর্ত্তী করাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ঐরূপ করিলে বেদান্তপরিভাষায় প্রদর্শিত কেবল-লক্ষণার উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' কথাটি লক্ষিত-লক্ষণার মধ্যে পড়িবে। উক্ত গ্রন্থে লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণরূপে প্রদর্শিত দ্বিরেফাদিপদে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি।

বেদান্তমতের সমালোচনা

"মধুব্রতো মধুকরো মধুলিণ্মধুপালিনঃ।
দ্বিরেফ-পুষ্পলিড্‌ভৃঙ্গ-ষট্‌পদ-ভ্রমরালয়ঃ" ॥

(অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)

এইরূপ অভিধান দেখিয়া আমি বলিতে চাই যে, দ্বিরেফশব্দ অভিধাবৃত্তির সাহায্যেই ভ্রমর অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

জহল্লক্ষণা এবং অজহল্লক্ষণাও বস্তুতঃ লক্ষণলক্ষণা ও উপাদানলক্ষণারই নামান্তর। জহদজহল্লক্ষণানামে স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করা আমার বিবেচনায় অযৌক্তিক; কারণ, তাঁহার প্রদর্শিত উদাহরণ 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' প্রভৃতিস্থলে কাকশব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ না করিয়া স্বার্থের সহিত অন্যার্থ বুঝাইতেছে বলিয়া বস্তুতঃ অজহল্লক্ষণাই হইতেছে। এই সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা অপ্পয়দীক্ষিতের মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

লক্ষণার প্রকারভেদসম্বন্ধে যে কয়টি প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটির সহিতই আমার মতের মিল হইতেছে না দেখিয়া আমার নিজস্ব মত জানিবার জন্য স্বভাবতঃই পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহল জন্মিবে। অতএব, সম্প্রতি ঐ সম্বন্ধে আমার নিজের মতটি জানাইয়া রাখি।

প্রথমতঃ, উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণাভেদে লক্ষণা দ্বিবিধ। ইহাদের স্বরূপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা আমিও স্বীকার করি। দ্বিতীয়তঃ,

নিজস্ব মত

উক্ত লক্ষণাদ্বয়ের প্রত্যেকটি আবার সারোপা ও সাধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ। যে স্থলে বাক্যে বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই প্রয়োগ আছে, সেই স্থলে সারোপা এবং যে স্থলে ইহাদের একটির প্রয়োগ আছে, অপরটির প্রয়োগ নাই, সেইস্থলে সাধ্যবসানা লক্ষণা হইয়া থাকে। মূলতঃ, ইহাদের স্বরূপ এবং উদাহরণ সম্বন্ধেও আমি অন্যান্য গ্রন্থকারদের সহিত একমত। আমার মতে, লক্ষণাতে এই চারিটি মাত্র ভেদ স্বীকার করা উচিত।

মৎপ্রণীত 'কাব্য-প্রভাকরঃ' নামক সংস্কৃতভাষাময় গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত গ্রন্থখানা এযাবৎ মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই।

উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণা নামে লক্ষণার যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে অজহৎস্বার্থা এবং জহৎস্বার্থাও বলা হয়। এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। উপাদানলক্ষণাস্থলে লক্ষক শব্দ নিজের অর্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, এই কারণে ইহা স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে না বলিয়া ইহাকে অজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা বলে। অপর পক্ষে, লক্ষণলক্ষণায় লক্ষক শব্দ নিজের অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থের সহিত যোগবিশিষ্ট অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়; এই কারণে, স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে বলিয়া ইহাকে জহৎস্বার্থা

অন্যান্য আলোচনা

বলা হয়। অজহৎস্বার্থা স্থলে 'লাঠি যাইতেছে' বলিলে লাঠিশব্দে লাঠিধারী পুরুষকে বুঝায়, আর জহৎ-স্বার্থা স্থলে 'গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম' বলিলে গঙ্গাশব্দ নিজ অর্থ জলপ্রবাহবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তীরকে বুঝায়—এই মাত্র প্রভেদ।

লক্ষণ-লক্ষণাস্থলেও লক্ষকশব্দ নিজের মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই লক্ষণার বিশেষত্ব। সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত অর্থ বুঝাইলে তখন লক্ষণা হইবে না; তাদৃশস্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমাগম ঘটিবে। 'গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম' বলিলে গঙ্গাশব্দে যে তীরকে বুঝায়, তাহার সহিত গঙ্গার সংযোগসম্বন্ধ আছে। এই-ভাবে অন্যরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও লক্ষণা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। সাহিত্যদর্পণে আচার্য্য বিশ্বনাথ বিভিন্ন সম্বন্ধে লক্ষণার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) রাজার কর্মচারীকে যাইতে দেখিয়া যখন কেহ বলে 'ঐ রাজা যাইতেছেন' তখন এই 'রাজা'পদে স্বস্বামি-ভাব সম্বন্ধে লক্ষণা হয়। (২) হস্তের অগ্রভাগমাত্র দেখাইয়া যখন বলা হয় 'এই হাত,' তখন 'হাত' পদে অবয়বাবয়বিসম্বন্ধে লক্ষণা, (৩) কর্মকারের কার্য্য করেন, এমন ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া যদি বলা হয় 'ইনি কর্মকার', তাহা হইলে 'কর্মকার' পদে তাৎকর্ম্ম্যলক্ষণসম্বন্ধে, এবং (৪) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্থূণাসমূহ দেখাইয়া যখন

বলা হয় 'ইঁহারা ইন্দ্র', তখন 'ইন্দ্র'পদে তাদর্থ্যলক্ষণসম্বন্ধে লক্ষণা হইয়া থাকে। এই সকল উদাহরণ দেখাইয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, এইরূপে অন্যান্য সম্বন্ধেও লক্ষণা হইতে পারে। বস্তুতঃ, বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে লক্ষণা হয় কি না, ইহা বিতর্কের বিষয়।

আমাদের বিবেচনায় বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত উল্লিখিত উদাহরণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটিতে সাদৃশ্যপ্রতিপাদন-হেতু ব্যঞ্জনা হইয়াছে। রাজার মধ্যে যেমন শাসনকর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে, রাজকর্ম্মচারীর মধ্যেও তেমনি তাহা আছে—এই অর্থে উক্তরূপ প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয় উদাহরণে অভিধার সাহায্যেই অর্থবোধ হইতেছে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রভৃতি লক্ষণার উদাহরণে গঙ্গাদি শব্দ স্বার্থ-ব্যতিরিক্ত তীরাদি অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু হস্তের অগ্রভাগকে হস্ত বলিলে তাদৃশ অন্যার্থে প্রয়োগ হয় না; অতএব উক্ত স্থলে লক্ষণাই হয় নাই। তৃতীয় উদাহরণে তুল্যকর্ম্ম-কর্তৃত্বরূপ সাধর্ম্ম্য হেতু এবং চতুর্থ উদাহরণে পূজ্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্য হেতু ব্যঞ্জনা হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সাধারণতঃ কি কি কারণে লক্ষণা হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন—তাৎস্থ্য, তাদ্ধর্ম্ম্য, তৎসামীপ্য, তৎসাহচর্য্য এবং তাদর্থ্য হেতু লক্ষণা হইয়া থাকে (ক)।

(ক) তাৎস্থ্যাত্তথৈব তাদ্ধর্ম্ম্যাত্তৎসামীপ্যাত্তথৈব চ।
তৎসাহচর্য্যাত্তাদর্থ্যাজ্ জ্ঞেয়া বৈ লক্ষণা বুধৈঃ ॥(পরমলঘুমঞ্জূষাধৃত)

এইগুলির উদাহরণও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। (১) 'শয্যা হসতি' বলিলে তাৎস্থ্যসম্বন্ধবশতঃ শয্যাশব্দে শয্যাস্থিত বালক বা বালিকাকে বুঝায়। (২) 'সিংহো মাণবকঃ' বলিলে তাদ্ধর্ম্ম্যসম্বন্ধ হেতু সিংহশব্দে 'সিংহের ন্যায় তেজস্বী' অর্থ বুঝায়। (৩) 'বটে গাবঃ' বলিলে সামীপ্যসম্বন্ধ হেতু বটশব্দে বটগাছের নীচ বুঝায়। (৪) 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' বলিলে তৎসাহচর্য্যসম্বন্ধ হেতু যষ্টিশব্দে যষ্টিধারী পুরুষকে বুঝায়। (৫) 'অমী ইন্দ্রাঃ' স্থলে তাদর্থ্য-সম্বন্ধ হেতু ইন্দ্রশব্দে স্থূণাসমূহকে বুঝায়।

বস্তুতঃ, উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মধ্যে—'সিংহো মাণবকঃ' এবং 'অমী ইন্দ্রাঃ' এই দুইটি স্থলে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ দ্বারা অর্থের প্রতীতি হওয়ায় আমরা লক্ষণা স্বীকার করা সমীচীন মনে করি না।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম দশটি বিভিন্ন সম্বন্ধে লক্ষণার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন (ক)। তিনি বলেন —(১) 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' বলিলে সহচরণরূপ সম্বন্ধ হেতু যষ্টিশব্দে যষ্টিধারী ব্রাহ্মণকে বুঝায়। (২) 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' বলিলে তাৎস্থ্যসম্বন্ধ হেতু মঞ্চ শব্দে মঞ্চস্থিত বালককে বুঝায়। (৩) 'বীরণেষ্বাস্তে' বলিলে তাদর্থ্য-সম্বন্ধ হেতু

(ক) সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-বৃত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-বাল-কট-রাজ-সক্তু-চন্দন-গঙ্গা-শকটান্নপুরুষেষ্বতদ্ভাবেঽপি তদুপচারঃ। (গৌতমসূত্র ২।২।৬৪)।

কটে বীরণত্বের, (৪) 'অয়ং রাজা যমঃ' বলিলে বৃত্ত-(স্বভাব) সাদৃশ্যরূপ সম্বন্ধ হেতু রাজাতে যমত্বের, (৫) 'প্রস্থঃ সক্তুঃ' বলিলে মান-(পরিমাণ) সম্বন্ধ হেতু সক্তুতে প্রস্থত্বের, (৬) 'চন্দনং তুলা' বলিলে ধারণসম্বন্ধ হেতু চন্দনে তুলাত্বের, (৭) 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে সামীপ্য-সম্বন্ধ হেতু গঙ্গাতে তীরত্বের, (৮) 'কৃষ্ণঃ শকটঃ' বলিলে কৃষ্ণগুণের সহিত যোগসম্বন্ধ হেতু শকটে কৃষ্ণত্বের, (৯) 'অন্নং প্রাণাঃ' বলিলে প্রাণসাধনরূপ সম্বন্ধ হেতু অন্নে প্রাণত্বের, এবং (১০) 'অয়ং কুলস্য রাজা' বলিলে আধিপত্য-সাদৃশ্য-রূপ সম্বন্ধ হেতু পুরুষে রাজত্বের আরোপ হইয়া থাকে (খ)।

(খ) যষ্টিত্বারোপো ব্রাহ্মণে সাহচর্য্যাৎ। মঞ্চত্বারোপো বালেষু, তাৎস্থ্যাৎ। কটেষু বীরণত্বারোপঃ, তাদর্থ্যাৎ। রাজ্ঞি যমত্বারোপঃ, বৃত্তাৎ। সক্তৌ প্রস্থত্বারোপঃ, তন্মানকত্বাৎ। চন্দনে তুলাত্বারোপঃ, তদ্ধার্য্যত্বাৎ। গঙ্গায়াং তীরধর্ম্মাধারত্বারোপঃ, তৎসামীপ্যাৎ। শকটে তদ্ধর্ম্মকৃষ্ণত্বারোপঃ, কৃষ্ণগুণযোগাৎ। অন্নেষু প্রাণত্বারোপঃ, প্রাণসাধনত্বাৎ। পুরুষে রাজত্বারোপঃ, কুলাধিপত্যাৎ। ইতি তদ্ব্যাখ্যাতারঃ।

(মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদকৃত সাহিত্যদর্পণটিপ্পনী)

দ্রষ্টব্য— মঃ মঃ ফণিভূষণতর্কবাগীশ-সম্পাদিত গ্রন্থ অনুসারে উক্ত ন্যায়সূত্রের সংখ্যা—২।২।৬২, এবং সূত্রে বাল শব্দ স্থলে মঞ্চ শব্দ ও শকটশব্দস্থলে শাটক শব্দ পঠিত হইয়াছে। মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদের প্রদর্শিত পাঠটি অধিকতর সঙ্গত মনে করিয়া আমরা

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মধ্যে 'অয়ং রাজা যমঃ' এবং 'অয়ং কুলস্য রাজা' এই দুইটি উদাহরণে সাদৃশ্যসম্বন্ধ হেতু ব্যঞ্জনার প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

উল্লিখিত তাৎস্থ্য প্রভৃতি বা গৌতম-সম্মত সহচরণ প্রভৃতি যে সকল হেতু দেখান হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্যত্রও লক্ষণা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। মোট কথা, 'স্বসংযুক্ত অপরার্থ বুঝাইলেই লক্ষণা হইবে' এই স্থলে সংযুক্ত শব্দটির 'যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত' এইরূপ অর্থ আচার্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও বলিতে চাই যে, লক্ষণার প্রতিবন্ধক হেতু না থাকিলে বাধিত মুখ্যার্থের সহিত যে কোন প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলেই লক্ষণা হইবে।

আচার্য্য জয়দেব বলেন— আভিমুখ্য প্রভৃতি কয়েকটি কারণে লক্ষণা হইয়া থাকে; যথা—

"আভিমুখ্যাৎ সন্নিধানাত্তথাকারপ্রতীতিতঃ।
কার্য্যকারণভাবাচ্চ বাচ্যবাচ্যকভাবতঃ॥
ইত্যেবমাদিসম্বন্ধাৎ কিঞ্চান্যস্মাচ্চতুষ্টয়াৎ।
সাদৃশ্যাৎ সমবায়াৎ সা বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়ান্বয়াৎ॥"

তাহাই প্রদর্শন করিলাম। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা কোন কোন স্থলে কিছু কিছু আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় তাহা প্রদর্শন না করিয়া মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই প্রদর্শন করিলাম।

আভিমুখ্যসম্বন্ধে, যথা—'অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্'। সন্নিধান-সম্বন্ধে—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'।

কারিকাস্থিত 'আকার-প্রতীতি' কথাটির তাৎপর্য্য 'রাকাগম' নামক টীকার রচয়িতা গাগাভট্ট বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি ইহার কোন উদাহরণ না দিয়া লিখিয়াছেন—

"একত্র বাস্তবোঽপরত্র ভ্রান্তিবিষয়ঃ। অত্র হেতুমাহ—তথাকারেতি। সান্নিধ্যাকারপ্রতীতিতঃ ইত্যর্থঃ।"

বস্তুতঃ 'আকারপ্রতীতি' একটি পৃথক্ হেতু। ইহার উদাহরণ, যথা—ভীমের মত বিশালকায় লোক দেখিয়া 'ভীম আসিতেছে' বলিলে ভীমশব্দে লক্ষণা। এই ভাবে, 'হাতীর মত বিশাল' অর্থে 'এ যে একটা হাতী' বলিলে হাতী শব্দে আকার-প্রতীতি হেতু লক্ষণা হয়—ইহাই কারিকাকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়; কারণ, আভিমুখ্য বা সন্নিধানরূপ হেতুর বিশেষণরূপে 'আকার-প্রতীতি' শব্দের প্রয়োগ করার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। উক্ত দুইটি স্থানে বাস্তব ও অবাস্তব ভেদেই হউক, বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক, কোনরূপ উল্লেখ-যোগ্য আকার-প্রতীতি আছে বলিয়া আমরা অনুভব করি না। এতাদৃশ আকার-প্রতীতি গৌণীলক্ষণারই একটি প্রকারবিশেষ। আমরা যে ঈদৃশস্থলে লক্ষণা স্বীকার করি না, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কার্য্যকারণভাব দ্বিবিধ। 'ঘৃতমায়ুঃ' বলিলে ঘৃতশব্দের লক্ষ্য আয়ুঃ পদে কার্য্যত্বসম্বন্ধে এবং 'আয়ুর্ঘৃতম্' বলিলে আয়ুঃপদলক্ষ্য ঘৃতে কারণত্বসম্বন্ধে লক্ষণা হয় বলিয়া জয়দেব মনে করেন।

বাচ্যবাচকভাবও দুই প্রকার। ছিরেফ শব্দের অর্থ ভ্রমর। 'ছিরেফমুচ্চারয়তি' বলিলে ছিরেফ পদ যৌগিকার্থ দ্বারা ভ্রমরকে বুঝায়। এই ক্ষেত্রে ভ্রমরের সহিত ছিরেফশব্দের বাচ্যত্ব-সম্বন্ধ। আবার 'ঘটমুচ্চারয়তি' বলিলে ঘটপদে বাচকতাসম্বন্ধে লক্ষণা হয় বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। কারিকায় আদি শব্দ গ্রহণ করিয়া আচার্য্য জানাইয়াছেন যে, এতদ্ব্যতিরিক্ত-সম্বন্ধেও লক্ষণা হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ছিরেফ প্রভৃতি শব্দে যে লক্ষণাই হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

জয়দেবের মতের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পৃথগ্‌ভাবে পুনরায় লক্ষণার অঙ্গ চারিটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—সাদৃশ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং ক্রিয়াদ্বয়। সাদৃশ্যে—গৌর্বাহীকঃ। সমবায়ে—ছত্রিণো গচ্ছন্তি। বৈপরীত্যে—অকুশলকে কুশল বলা। ক্রিয়াদ্বয়ে—যুধিষ্ঠিরো রাজা।

বস্তুতঃ, সাদৃশ্যস্থলে যে লক্ষণা হয় না, বৈচিত্র্যহেতু ব্যঞ্জনার প্রবেশ এবং তাহার ফলে অর্থালঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'

এই উদাহরণেও সমবায়রূপ হেতু স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুতঃ, এই ক্ষেত্রেও ছত্রধারীর সাহচর্য্যহেতুই ছত্রিন্ শব্দে ছত্রহীনকেও বুঝাইয়াছে।

বৈপরীত্যসম্বন্ধস্থলে মুখ্যার্থের সহিত যোগ না থাকায় যে লক্ষণাই হয় না, বরং ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটে, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। 'যুধিষ্ঠিরো রাজা'—এই উদাহরণেও 'যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক' অর্থে যুধিষ্ঠির শব্দের গ্রহণ হইয়াছে; কাজেই এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকায় রূপক বা উপমালঙ্কারের প্রবেশ ঘটিয়াছে। অতএব, অর্থবোধ লক্ষণার সাহায্যে না হইয়া ব্যঞ্জনার সাহায্যে হইল। বৈচিত্র্যস্বীকার না করিলেও তাৎকর্ম্ম্যসম্বন্ধদ্বারা লক্ষণার সিদ্ধি হইতে পারে; কাজেই ক্রিয়াদ্বয়রূপে পৃথক্ হেতু স্বীকার করা অনাবশ্যক।

লক্ষণার হেতু সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, কোন শব্দ-দ্বারা স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ হইলে, মুখ্যার্থের সহিত তাহার যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেই লক্ষণা হইবে; কিন্তু স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ না হইলে লক্ষণা হইবে না। লক্ষণা-স্থলে অন্বয়ানুপপত্তিরূপ হেতু থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ হেতু না থাকিলে সম্বন্ধ থাকিলেও লক্ষণা হইবে না। তাৎস্থ্য প্রভৃতি অথবা আভিমুখ্য ইত্যাদি কতকগুলি হেতু দিক্‌প্রদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু

সাদৃশ্য প্রভৃতি স্থলে স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ না হওয়ায় এবং অন্বয়ানুপপত্তিরূপ মূল হেতু না থাকায় লক্ষণা হইবে না।

কেবলমাত্র শব্দেই লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয়, বাক্যে নহে; ইহাই সাধারণ অভিমত। কিন্তু মীমাংসকগণ বাক্যেও লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অন্যেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণ মীমাংসকদের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসকেরা বলেন—'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' এই বাক্যে বাক্যার্থপ্রতিপাদনের পরই লক্ষণার প্রবেশ হইয়াছে; অতএব, এই স্থলে লক্ষণা বাক্যগত। তাঁহারা বলেন —নদীপদে তীর লক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে গভীরা-শব্দের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য হয় না; কারণ, তীর গভীর নহে। অতএব, পদগত-লক্ষণাস্বীকারে অন্বয়ের উপপত্তি হয় না বলিয়াই উক্তস্থলে বাক্যগত লক্ষণা স্বীকার্য্য।

মীমাংসক ও নৈয়ায়িক মতের পার্থক্য

নৈয়ায়িকেরা বলেন—উক্তস্থলে নদীপদই লক্ষ্যার্থ-দ্বারা গভীর নদীর তীরকে বুঝাইতেছে। তাহার বিশেষণ গভীর শব্দটি তাৎপর্য্যমাত্রগ্রাহক। কাজেই, লক্ষণা পদগতই হইল; বাক্যগত নহে। তাঁহাদের মতে 'গভীরায়াং' পদেও গভীরনদীতীর অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা যাইতে পারে। তখন নদীপদটি তাৎপর্য্যগ্রাহক হইবে। গভীরনদীর তীর

প্রতিপাদনই উক্ত তাৎপর্য্যগ্রহণের হেতু (গ)।

আলঙ্কারিকদের মধ্যেও বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ লক্ষণার বাক্যগতত্বও স্বীকার করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণও সমাসে শক্তি স্বীকার করিয়াছেন; এবং সমাসের বাক্যত্বও স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং 'চিত্রগুঃ' প্রভৃতি সমস্তপদের অর্থ-প্রতিপাদনের জন্য স্বীকার করিতে হয় যে, বৈয়াকরণ-গণও বাক্যে লক্ষণার স্বীকর্ত্তা। আমরা যে লক্ষণার কেবল পদগতত্বই স্বীকার করি, বাক্যগতত্ব স্বীকার করি না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(গ) বাক্যে তু শক্তেরভাবাচ্ছক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণাপি নাস্তি। যত্র 'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' ইত্যুক্তং তত্র নদীপদস্য নদীতীরে লক্ষণা। গভীরপদার্থস্য নদ্যা সহাভেদেনান্বয়ঃ ক্বচিদেকদেশান্বয়স্যাপি স্বীকৃতত্বাৎ। যদি তত্রৈকদেশান্বয়োঽপি ন স্বীক্রিয়তে, তদা নদীপদস্য গভীরনদীতীরে লক্ষণা, গভীরাপদং তাৎপর্য্যগ্রাহকম্। (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)